সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা : নিবেদিতার কলমে তার গুরুত্ব

প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। ১৮৮৬ সাল, জানুয়ারি মাস। কয়েকদিন বাদেই পৌষসংক্রান্তি। বুড়োগোপাল বারোখানা গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা এনেছেন; ইচ্ছা—গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদের দেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাপড়গুলি নিয়ে নিজের এগারো জন ত্যাগী শিষ্যকে দিলেন। বললেন, ওই সাধুদের গেরুয়া কাপড় দিলে যে-ফল হবে, তার হাজার গুণ বেশি ফল হবে তাঁর এইসব ত্যাগী ছেলেদের দিলে। এদের এক-এক জন হাজার সাধুর সমান। একটি গেরুয়া কাপড় রেখে দিলেন গৃহী ভক্ত গিরিশ ঘোষের জন্য।

ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীশ্রীমা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ত্যাগের আদর্শ দেখাতে। এমন ত্যাগ মানব-ইতিহাসে এর আগে কেউ কখনও দেখেনি। ত্যাগের আদর্শে নিজেই তাঁর সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—একদিকে সর্বত্যাগী শিষ্যগণ, অপরদিকে অন্তরে ত্যাগের আদর্শে দৃঢ়চিত্ত গৃহী ভক্তেরা।

বহু ছোট ছোট ঘটনা ঘটে চলেছিল বহুদিন ধরেই—যেগুলির পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল—''জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।'' একথা শুনে নরেন্দ্রনাথ সংকল্প করেন, সুযোগ পেলে এই বাণী তিনি জগতে প্রচার করবেন। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে শ্রীরামকৃষ্ণ একান্তে বহু উপদেশ দিতেন—তাঁর অবর্তমানে ত্যাগী যুবক শিষ্যরা যাতে সংসারে ফিরে না গিয়ে একসঙ্গে থেকে সাধনভজনে নিরত থাকেন।

নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভর্ৎসনা করে তাঁকে বলেন, ''ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে।... আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা!'' নিজের মুক্তির বাসনাও ত্যাগ করে অপরের সেবা—'ত্যাগ ও সেবা'—এই-ই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত নবযুগের আদর্শ।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর নরেন্দ্রনাথ ত্যাগী গুরুভাইদের একত্রিত করে বরাহনগর মঠে বাস করতে শুরু করলেন। কঠোর তপস্যার জীবন। এরই মধ্যে আঁটপুরে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প। মঠে ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির

সামনে বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিয়ে বেশির ভাগই বেরিয়ে পড়লেন তপস্যায়। স্বামীজী বেরিয়ে পড়লেন স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে, হিমালয়ে তপস্যার সংকল্প নিয়ে। হিমালয়ের নির্জন গুহায় পৌঁছল তাঁর ভগিনীর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ। ভারতীয় নারীর শোচনীয় অবস্থা তাঁকে নাড়িয়ে দিল। এক প্রবল কর্মপ্রেরণা তাঁকে পাহাড় থেকে সমতলে নামিয়ে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—সারা ভারতবর্ষ পর্যটন করাল। স্বচক্ষে দেখলেন দরিদ্র, নিপীড়িত, অসহায়, অশিক্ষা-লোকাচার-দেশাচারে পিষ্ট ভারতবাসীর করুণ অবস্থা। ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে ধ্যানমগ্ন হলেন তিনি। ধ্যানের বিষয় ভারতবর্ষ। কীভাবে দেশবাসীর উন্নতি সম্ভব? তিনি জানেন ''খালি পেটে ধর্ম হয় না।'' তাই প্রথমে চাই অন্ন-বস্ত্র। তারপর শিক্ষা, কারিগরি বিদ্যা, যাতে তারা উপার্জনক্ষম হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এই শিক্ষাদান করবে কে? ভারতবর্ষে তীর্থে তীর্থে সন্ন্যাসীরা ঘুরে বেড়ান অথবা কুঠিয়ায়, মঠে-মন্দিরে একান্তে তপস্যা করেন। নিজের মুক্তির চেষ্টাই তাঁদের উদ্দেশ্য, জনসমাজের প্রতি তাঁদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। স্বামীজী পরিকল্পনা করলেন, এই সাধুরা যদি জনগণের শিক্ষাবিস্তারের কাজে এগিয়ে আসেন তাহলে সমাজ বহুভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু এ-কাজে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তাই স্থির করলেন, তিনি আমেরিকায় যাবেন। সেখানে ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ দান করে আনবেন স্বদেশবাসীর জন্য অর্থ।

১৮৯৩ সালের জুন থেকে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত স্বামীজী ভারতের বাইরে ছিলেন। তাঁর বেদান্তবাণী প্রচারে পাশ্চাত্য দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। স্বামীজী দেখলেন পাশ্চাত্যে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অনেক কাজ সহজে করে। যে-অভ্যাস এদেশে একেবারেই নেই। স্বামীজীর সামনে তখন এটিই চ্যালেঞ্জ। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো তাঁর ত্যাগী শিষ্যদের একত্রিত করা গেছে, যদিও তাঁদের অনেকেরই ঝোঁক একান্ত তপস্যায়। এঁদের মধ্যে অখণ্ডানন্দজী মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। স্বামীজী হৃদয়ঙ্গম করলেন, এখনই সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবসেবায় আত্মনিয়োগ করার উপযুক্ত সময়। ১৮৯৭-এর এপ্রিলের শেষাশেষি আলমবাজার মঠে বসে রামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলি প্রণয়ন করলেন স্বামীজী। মূল উদ্দেশ্য—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। গুরুভাইরা কেউ কেউ অবশ্য এই পরিকল্পনা বিনা দ্বিধায় মেনে নেননি। প্রায় বছর খানেক পরে ভারতে এসে স্বামীজীকে দেখে ভগিনী নিবেদিতার মনে হয়েছিল 'পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ', যিনি পরিকল্পনামতো কাজ করে উঠতে পারছেন না বলে ছটফট করছেন। আন্দাজ করাই যায়, গুরুভাইদের স্বমতে আনতে স্বামীজীর অনেকটাই সময় লেগেছিল—তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবৎকালের হিসেবে। ক্রমে গুরুভাইদের সন্দেহ চলে যেতে লাগল; তাঁরা অনুভব করলেন ঠাকুরের হাতের যন্ত্র হয়েই স্বামীজী কাজ করছেন।

নিয়মাবলি প্রণয়ন করার অল্প পরেই, ১ মে ১৮৯৭ বলরামবাবুর বাড়িতে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন'।

স্বামীজীর পাশ্চাত্যবিজয় ভারতবর্ষের গোঁড়া হিন্দুসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আর ছিল খ্রিস্টান সমাজ ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির শত্রুতা। স্বামীজী যখন ভারতে ফিরলেন, তখন একদিকে বিপুল উৎসাহ, উন্মাদনা, বক্তৃতার আয়োজন; অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ভ্রূকুটি—সন্ন্যাসীদের মঠে ম্লেচ্ছদের যাতায়াত, খাওয়াদাওয়ায় বাছবিচার না থাকা ইত্যাদি দেখে। দেশাচারই তাদের কাছে ধর্ম বলে বিবেচিত ছিল।

১৮৯৮ সালের গোড়ায় মার্গারেট নোবল কলকাতায় এলেন। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। নতুন মঠের জন্য জমি কেনা হয়েছে। মার্গারেট আসার কিছুদিন পরে মিসেস ওলি বুল এবং মিস ম্যাকলাউড এলেন। বেলুড়ে গঙ্গার ধারে একটি পুরনো বাড়ি মেরামত করে নিয়ে তাঁরা সেখানেই থাকতে শুরু করলেন। মার্গারেটও তাঁদের কাছে চলে এলেন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল মার্গারেট দেখলেন ইংল্যান্ডে যিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, বেদান্তের প্রবক্তা, ঈশ্বরপ্রেরিত আচার্য, তিনিই নিজের দেশে গুরুভ্রাতাদের নিয়ে মঠ স্থাপন করেছেন। গড়ে উঠছে এক নতুন ধারার সন্ন্যাসিসঙ্ঘ—তা নিয়ে স্বামীজীর ঘরে-বাইরে কত সংগ্রাম!

মঠে পুরনো বাড়ির উঠোনে একটি আমগাছের তলায় নিবেদিতারা তিনজন প্রাতরাশ করতেন। তখন স্বামীজী তাঁদের কাছে এসে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রসঙ্গ করতেন। এভাবেই যুগাচার্য ভারতবর্ষকে একটু একটু করে চিনতে শেখালেন তাঁদের।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বামীজী গৃহী ভক্তদেরও এই নব আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে সঙ্ঘজননী, সঙ্ঘের চালিকা শক্তি বলে ঘোষণা করলেন। তিনি আগে মাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের মঠ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, সে-মঠে থাকবেন বিদেশিনীরাও, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট উপাদানে গড়ে উঠবে এক নব শিক্ষা-আন্দোলন। সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্বামীজী এ-ব্যাপারে ছিলেন বদ্ধপরিকর। যোগানন্দজী তাঁকে সাবধান করে দেন, শ্রীশ্রীমাকে এখনই প্রকাশ্যে কেন্দ্রে বসিয়ে স্ত্রীমঠের আয়োজন করলে তাঁকে স্থূলদেহে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না; যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন বহু লোক তাঁকে অবতার বলে চিনতে পারলে তাঁর শরীর থাকবে না। শুনে স্বামীজী নিরস্ত হন।

এরপরের পদক্ষেপ ছিল নিবেদিতার বিদ্যালয় স্থাপন। ১২ নভেম্বর ১৮৯৮ শ্রীশ্রীমা বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরপূজা করে আসেন, পরদিন বাগবাজারে নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজী এক পত্রে মিসেস ওলি বুলকে লিখেছিলেন, ''এদেশে আমার দুটি কাজ ছিল। একটি হয়েছে (পুরুষ মঠ)। অপরটি (মেয়েদের মঠ) হওয়ার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।''

দৈব ইচ্ছায় নিবেদিতার বিদ্যালয়টি শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থানের কাছেই স্থাপিত হল। ফলে নিবেদিতা এবং অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীরা—সকলেই মায়ের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেলেন। স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল—ছাত্রীরা ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের কাছ থেকে পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে ভারতীয় নারীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে। এইভাবে ভবিষ্যৎ সমাজে ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বজনীন এক সংস্কৃতি।

রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কর্মপ্রণালী জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, গোটা

সমাজের ওই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া আশু প্রয়োজন। তাই এই উদ্দেশ্যে কলম ধরলেন নিবেদিতা। প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'ব্রহ্মবাদিন' প্রভৃতি পত্রিকায়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-প্রবর্তিত ত্যাগ ও সেবার আদর্শ জনসমাজে কার্যকরী করে তুলতে হলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। নিবেদিতা বুঝেছিলেন এদেশে একমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করেই কোনও নতুন ভাব গৃহীত হতে পারে। খ্রিস্টানদের যেমন 'Mass Prayer' (সমবেত প্রার্থনা) সেইরকম হিন্দুদের মধ্যেও যদি প্রচলিত হয়—যথা কোনও ধর্মানুষ্ঠানে বহু মানুষ সমবেত হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে—তাহলে একসঙ্গে কাজ করার একটা ধারণা জন্মাবে। তাই তিনি লিখলেন, ''ধর্ম আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, মানুষের মধ্যেও মেলবন্ধন ঘটায়। আমরা সকলে যদি জগদম্বার সন্তান হই, তাহলে আমরা পরস্পর সহোদর। একদিকে উত্তরণ হলে অপরদিকেও সমান্তরাল প্রসার ঘটিয়ে সার্বিক বিকাশ তথা সামঞ্জস্য রাখতে হয়। তাই সর্বজনীন উপাসনায় মনোযোগ দিলে অধিকসংখ্যক মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।'' আরও লিখলেন, ''আমাদের এখন প্রয়োজন ধর্মের সঙ্গে সমাজচেতনার যোগ—এক আলোকপ্রাপ্ত আপনবোধ, সেখানে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাজ সহজ ও উন্নততর হয় যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা করা যায়। অর্থাৎ একটি আদর্শে বিশ্বাসী কোনও সংগঠন যদি কাজটি করে।... সফল হতে হলে কাজে একতানতা দরকার। উৎসাহী কয়েকজন যারা কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রে থাকবে, তাদের মধ্যে এক নিবিড়, অটুট ভালবাসার বন্ধন থাকা চাই।'' বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশেও সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে বহু জনকল্যাণমূলক কাজও হয়। এভাবে ধর্মের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ কাজ করার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

ভগিনী নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন সামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সঙ্ঘ ভারতে একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। তাই বুঝিয়ে বললেন, এক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজন বুঝে কাজ করতে হবে। পরোপকারার্থে কর্মপ্রচেষ্টা সফল হতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম, চিন্তা এবং জ্ঞানের বিকাশ। এ-জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, আবার অভিজ্ঞতার জন্য দরকার কর্ম।

নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মেলবন্ধনে মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগ আসছে। তাই বলেছিলেন, ''মানবজাতি এক। সকলের জন্য তার প্রতিটি অংশেরই প্রয়োজন। রোমানদের সাংগঠনিক ক্ষমতা হিন্দুদের প্রয়োজন, হিন্দুদের উপনিষদের অন্তর্দৃষ্টি রোমানদের প্রয়োজন।''

স্বামীজী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশে এই বার্তাই দিয়েছেন : ''পরার্থে কাজই উৎকৃষ্ট ধর্ম সাধন।'' এই ভাবটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন নিবেদিতা : ''নিজেদের আরাম, বিশেষাধিকার, বিশ্রাম—সব বিসর্জন দিয়ে, নিজের অহং ত্যাগ করে অপরের জন্য, উচ্চ ভাব ও আদর্শের জন্য কাজ করা।... কর্মে যেন আমরা খাঁটি থাকি। আমাদের কাজই আমাদের 'স্বধর্ম'।... কাজই জগতে বিরাট সাধনা; তার দ্বারা আমরা চরিত্র গড়ে তুলি; আর যখন সময় আসে তারই দ্বারা আমরা নির্বিকল্প সমাধিতে পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। চরিত্র বলতে আত্মসংযম। এই সংযম থেকেই নিজের পথ আমরা খুঁজে পাই। পথ ঠিক হলে একাগ্রতা আসে। পূর্ণ একাগ্রতাই সমাধি। নিখুঁত কর্ম থেকে আসে পূর্ণ মুক্তি।... সে-কারণে আমরা যেন কাজে নিখুঁত হই।''

ভগিনী সচেতন করেছেন : ''আমাদের আর একটি কঠিন কর্তব্য রয়েছে। আমাদের অর্জিত জ্ঞান অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। এই সাধনাই আমাদের বিদ্যার্জনকে অর্থবহ করে তুলবে।... এই

বিদ্যাদানরূপ কর্মই সমাজের সর্বরোগহর মহৌষধ যা আমাদের অধ্যাত্মশক্তি জোগাতে পারে।''

কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে নিবেদিতার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ : ''প্রত্যেকের কাছে তার নিজের কর্তব্যকর্ম যোগীর ধ্যানের মতোই পুণ্য ও পবিত্র হবে।... সমস্ত কর্মই উপলব্ধি... লৌকিক আর পারমার্থিকের মধ্যে কোনও ভেদ নেই।... [মনে করবে] আমি এখন যে-কাজ করতে বসেছি তার থেকে উপযুক্ত আর কোনওটাই নয়... সে তাঁতবোনা কী ঝাঁট দেওয়া, হিসাব রাখা কী বেদ অধ্যয়ন, ধ্যানসাধনা অথবা এমনকী মুষ্টিযুদ্ধ যাই-ই হোক। আমি যা উত্তমরূপে জানি সেটি আমার জীবনে অভিব্যক্ত হোক।... কোনও মহৎ কাজের আহ্বান যেন আমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত না হয়, তার জন্য যত সাহসের প্রয়োজনই হোক না কেন। আমি বিফল হতে পারি... কিন্তু আমার বিফলতাকেও যেন শ্রদ্ধা করতে পারি। ব্যর্থ হওয়ার অধিকার আমার আছে। এই বিফলতার মাধ্যমেই আমি একদিন জয়লাভ করতে পারি।''

সঙ্ঘজীবন সম্বন্ধে বহু খুঁটিনাটি জানিয়েছেন নিবেদিতা : ''সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা জরুরি। এই শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের নিজেদের সংযত হতে হয়।... অপরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে গেলে প্রথমে নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা অভ্যাস করতে হয়। কর্তৃত্ব ও আজ্ঞাবহতা একই শক্তির এপিঠ-ওপিঠ। যত উচ্চ আমাদের শিক্ষা তত বেশি আমরা অপরের আদেশ পালনে সক্ষম হব। আজ যে শাসন করে গতকাল সে আজ্ঞা পালন করেছে। আমরা যেন এমনই আজ্ঞাবহ হই যাতে আগামীকাল আদেশ করতে পারি। শক্তিশালী মানবচরিত্রে বিপরীত গুণের সমাবেশের এই হল রহস্য।

''মানুষ শক্তিশালী হয় মনের একাগ্রতার দরুণ। একাগ্রতা বাড়লে মনকে বশে রাখার শক্তি বাড়ে। তা থেকে আসে জগতকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।''

নিবেদিতা বুঝেছিলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে মানবজাতির মূল্যবোধ কেমন পরিবর্তিত হতে চলেছে। তাই লিখছেন,

''আমরা এখন এক বিরাট ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থা লাভ করতে চলেছি। ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতি হয়ে দাঁড়াবে হিন্দুধর্মের নতুন বিকাশ। সমাজে গোঁড়ামির পরিবর্তে উদার নাগরিক জীবন, নতুন নতুন উপাসনা ও ধর্মীয় কৃচ্ছ্রতার পরিবর্তে শিক্ষা ও সহযোগিতার দ্বারা আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছি যা যুদ্ধক্ষেত্রে নামার জন্য আমাদের রক্ষাকবচ... তাতে কি আমাদের সনাতন ধর্মের ভিত নড়ে যাবে? না। বহুকাল আগেই আমরা কি শুনিনি—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'? দেবতার পূজার পরিবর্তে অভাবী, আর্ত, পীড়িতদের আমরা যদি ধৈর্য ধরে সেবা করি; খাদ্য, প্রশিক্ষণ ও বিদ্যা বিতরণ করি, তাতেই বা কী? যদি সবই সেই 'এক ও অদ্বিতীয়' হয়, তাহলে সব পথই সেই একত্বে পৌঁছনোর পথ; যুদ্ধ করাও পূজারই সমান, তেমনই প্রার্থনা, কায়িক পরিশ্রমও পূজায় গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র... পারস্পরিক সাহায্য বা সহযোগিতা যেকোনও পূজার তুলনায় উৎকৃষ্ট, কারণ একমাত্র মনের একাগ্রতাই সেই একত্ব দর্শনের উপায়—সেটিই একমাত্র উদ্দেশ্য।

'' ওই সেবাকাজে তোমার শরীর মন এক হয়ে যাক...। তোমার সমস্ত ক্ষমতা ওই কাজে একাগ্র হোক। যে-কাজ হাতে নিয়েছ দিবারাত্র তোমার চিন্তা তাতে নিবিষ্ট থাকুক। তোমার চরিত্র হোক পরম পথপ্রদর্শক। কাজে পরিপূর্ণতা আনাই হোক তোমার স্বপ্ন। এভাবে একসময় জ্ঞানোদয় হবে।''

স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি : ''লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না।'' কাজে পূর্ণতা আনতে হলে আমাদের সেকথা ভুললে চলবে না। নিবেদিতা তাই বলেছেন, ''...যে-কাজে হাত দিয়েছি, তাকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করব। আমরা আদর্শের জন্যই

আদর্শকে অনুসরণ করব; থামব না বা দাঁড়িয়ে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত না অনন্তের ডাক শুনব; এবং যে-ডাকে সাড়া না দিয়ে পারব না। শৈশবের সব খেলনা সরিয়ে আত্মার আনন্দনগরে প্রবেশের আহ্বান সেই ডাক।"

সঙ্ঘবদ্ধ হতে গেলে ভারতবাসীর যেসব গুণ অনুশীলন করা দরকার সেগুলি নিবেদিতা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন : ''আমাদের ঐক্যের পরীক্ষা হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের, আচরণের, ঋজুতার পরীক্ষা। এটি আবার একটি বিশেষ ধরনের চরিত্র যার দ্বারা বড় বড় সামাজিক সমষ্টি গঠন সম্ভব।"

কী কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দরকার উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা। প্রথম, ভদ্র আচরণ; দ্বিতীয়, সময়ানুবর্তিতা, গোছানো ও নিয়মিত অভ্যাস—এগুলিই হবে জাতীয় ধর্ম, কারণ এসব গুণের মূলে থাকে অপরের কল্যাণের জন্য আত্মসংযমের অনুশীলন।

''আমাদের শিখতে হবে অপরের সঙ্গে ব্যবহারে নির্ভরযোগ্য হতে।... কর্তব্য সম্পাদনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। যদি কর্তব্যকর্ম শেষ করতে না পারি তাহলে সেটি অর্ধসম্পন্ন যজ্ঞের মতো নিশ্চিত বিনাশকারী। তা চরমতম বিফলতা। সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাব বা শারীরিক কোনও অসুবিধাকে প্রাধান্য দেওয়া চলবে না। সেক্ষেত্রে নিজেকেই নিজে বুঝিয়ে দিতে হবে এটি 'আমার দায়িত্ব'। এই চিন্তাই আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা এবং কঠিনতম ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।...

''দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধের কারণেই সৈনিক তার কর্মক্ষেত্রে প্রাণ দেয়; দমকল কর্মী জ্বলন্ত আগুনের বিপদসংকুল স্থানে প্রবেশ করে। এই কর্তব্যবোধই সুপ্ত মনোবলকে জাগিয়ে তোলে। নেতিয়ে পড়া ইচ্ছাশক্তিকে অঙ্কুশ মারে—এটাই ধর্ম।

''সামাজিক স্তরে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠন দ্বারা কী কী জয় করা যায় তার নিদর্শন আমরা পাব পাশ্চাত্যে। তাই এক্ষেত্রে তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে।... দেখব ইউরোপীয়রা তাদের সমস্যা কেমন করে সমাধান করে। তার সঙ্গে আমাদের সমস্যাগুলিরও তুলনা করে দেখতে পারি যদি সম্ভব হয়। এভাবে আমরা কতখানি উপকৃত হব বা আদৌ হব কী না, তাও দেখব।

নিবেদিতা নিজেই তুলনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ''ভারতবর্ষে যেকোনও ধর্মানুষ্ঠান পুরোহিতের কর্ম। এখানে সন্ন্যাসী পরিব্রাজক বা গুহাবাসী যাই হোন না কেন একা বিচরণ করেন। তিনি ব্যক্তিস্তরে মহৎ এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু একটি সুদৃঢ় সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকার শৃঙ্খলাবোধ তাঁর কখনও থাকে না, যেখানে আজ্ঞাবহতা একটি কৃচ্ছ্রসাধনরূপ তপস্যা এবং সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, কর্মকুশলতা প্রভৃতি অভ্যাস কঠোরভাবে জারি থাকে। [অথচ এইরকম] সন্ন্যাসি-সংগঠন পাশ্চাত্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে আসছে মধ্যযুগ থেকেই। সেযুগে ধর্মীয় সংগঠনগুলি কৃষিকাজ, শিক্ষাদান, নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মপ্রচার করতেন। আর আধুনিক যুগে তাঁরা হাসপাতাল, Red Cross Sisterhood ইত্যাদি পরিচালনা করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় আর সাধারণ বিদ্যালয়ের ভিত তৈরি করে দিয়েছেন। ত্রাণসমিতিগুলি গড়ে উঠেছে।

''... ইউরোপীয় মঠগুলির বৈশিষ্ট্য হল তার পরিকাঠামো, তার সংগঠন, কাজের দায়িত্বের সুস্পষ্ট ভাগ।... এক ছাদের তলায় বহু মানুষ থাকলেও তাদের কর্তব্যকর্ম আলাদা ও নির্দিষ্ট থাকে।... দিনের প্রতিটি ঘণ্টার জন্য নির্দিষ্ট কাজ থাকে। সন্ন্যাসিসঙ্ঘগুলি ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত। প্রত্যেক সদস্যকে তার চেয়ে উচ্চপদস্থ সাধুর

আজ্ঞাবহ হতে হয়। সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি তাঁদের শৃঙ্খলাবোধ।

''এভাবে বহু শতাব্দী ধরে সঙ্ঘবদ্ধ কর্মধারা বিকাশের ফলে তাঁদের মধ্যে এমন এক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, এমন চরিত্র ও আচরণের ধারণা তৈরি হয়েছে যা থেকে বর্তমান যুগের বিরাট বাণিজ্যিক সংস্থা ও শিল্পসংস্থাগুলি গড়ে উঠেছে। বাস্তবিক একটিই সমাজ। তার একটি অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পাওয়া জ্ঞান সমগ্র সমাজে কাজে লাগে।...

''ভারতবর্ষে পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ করা যায় কৃষিকাজে। গ্রামগুলিতে জাতি, পেশা, পরিবার সবকিছুর মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।... এই কারণে শত বিপরীত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েও এদেশের স্থিতিশীলতা আর ঐক্য অটুট রয়েছে।... কেবল একটি বিষয়ে পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারত পিছিয়ে আছে। সেটি হচ্ছে তার সামাজিক পরিকাঠমোয় সঙ্ঘবদ্ধ কাজের ব্যবস্থা। সঙ্ঘবদ্ধ যেকোনও কাজে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই দায়িত্বশীল ও নির্ভরশীল হতে হবে। তবেই ক্ষমতা অর্জন করা যাবে; শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে পারবে।''

নিবেদিতার মতে, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর এই নতুন যুগে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে চলেছে, 'সন্ন্যাসী' শব্দটিও নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। গেরুয়া বসন নয়, নিঃস্বার্থপরতাই তাঁকে সাধু করেছে। এভাবে বিজ্ঞানী বা পণ্ডিত, কলাবিদ—যেকোনও বিশেষ গুণসম্পন্ন সাধু থাকতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেককেই নিঃস্বার্থ হতে হবে।

নিবেদিতার মনে হয়েছে, ''যেকোনও কাজ সম্পূর্ণ করাই এখন থেকে অধ্যাত্ম-অনুভূতি বলে গণ্য হবে।''

''যথার্থ সাধক সেবা করবেনই, কারণ বহুর সেবা ব্যতীত সত্যের উপলব্ধি হয় না।''

''বজ্রের মতো শক্তিশালী, কঠোর ব্রহ্মচর্যবান, মহৎ হৃদয় ও নিঃস্বার্থ—এই হবেন আদর্শ সন্ন্যাসী, যিনি সেবাকেই যথার্থ সন্ন্যাসরূপে গ্রহণ করবেন।'' —নিবেদিতা এভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য এবং ভবিষ্যতে সমাজে তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

একশো পঁচিশ বছর পর আশ্চর্য হয়ে দেখি এই ইঙ্গিত কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম ও ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব সাদরে গৃহীত হচ্ছে—মানুষের IQ (ইনটেলিজেন্স কোশেন্ট) ও EQ (ইমোশনাল কোশেন্ট)-এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে SQ (স্পিরিচুয়াল কোশেন্ট)। কেবল ধর্মপ্রতিষ্ঠান নয়, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও মধ্যেও এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছে। দেশে, বিদেশে বহু মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন হচ্ছে, বেদান্তদর্শন পড়ানো হচ্ছে। এভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেছে।

কেশবচন্দ্র সেন একবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার আদেশ প্রার্থনা করেন। তাতে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, তাঁর ভাব, তাঁর শক্তি বক্তৃতা বা খবরের কাগজের দ্বারা প্রকাশ করা যাবে না; যখন সময় হবে, তখন আপনাআপনি তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। শত শত হিমালয় চাপা দিলেও তখন কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের ভাব ও শক্তি তাঁর নামাঙ্কিত সঙ্ঘের মাধ্যমে জগতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং পড়ছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। Sister Nivedita, *Religion and Dharma* (Advaita Ashrama: Kolkata, 2012)